শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, বাস্তবতা ও উত্তরণের কৌশল

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 10 July 2026, 11:53 PM | বিভাগ: এইচআরএম

বিশ্বায়নের যুগে উচ্চশিক্ষা কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, জ্ঞান-অর্থনীতি, গবেষণা সক্ষমতা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সূচক। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণে যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো কিউএস র‍্যাংকিং। কিউএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, গবেষণা, আন্তর্জাতিকীকরণ, কর্মসংস্থান সক্ষমতা এবং একাডেমিক খ্যাতিসহ বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নির্ধারণ করে থাকে।

এই সূচকগুলোর মধ্যে “ফ্যাকাল্টি-স্টুডেন্ট রেশিও” বা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। কারণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত কম হয়, তত বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, তত্ত্বাবধান, গবেষণা সহায়তা এবং মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উন্নত বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই সূচকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিপরীতে বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং নীতিগত দুর্বলতার কারণে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও গুণগত মান উন্নয়নের প্রশ্নে এখনও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বিশেষত শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা শিক্ষার মান, গবেষণার পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। এই প্রবন্ধে কিউএস সূচকের আলোকে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের গুরুত্ব, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা, এর বহুমাত্রিক প্রভাব এবং উত্তরণের কার্যকর কৌশল বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

কিউএস র‍্যাংকিংয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতকে শিক্ষার মানের একটি কার্যকর সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এটি সরাসরি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ছোট ব্যাচভিত্তিক ক্লাস শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ বৃদ্ধি করে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলে এবং ইন্টার-অ্যাকটিভ শিক্ষা নিশ্চিত করে। একইসাথে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করতে পারেন। এর বিপরীতে বৃহৎ ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের যোগাযোগ সীমিত হয়ে যায়, মূল্যায়নের মান কমে যায় এবং গবেষণামুখী শিক্ষা ব্যাহত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, গবেষণা উৎপাদন এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি কৌশলগত একাডেমিক সূচকে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই সূচক আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে না পারলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মতো দেশে কিউএস সূচকের এই ধারণা উচ্চশিক্ষা সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার গত দুই দশকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ অনেক বেড়েছে। কিন্তু এই সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা অবকাঠামো এবং একাডেমিক সক্ষমতা উন্নয়ন না হওয়ায় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও সেই অনুপাতে যোগ্য ও পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সংকট তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর চাপ অত্যন্ত বেশি। অনেক বিভাগে একটি শ্রেণিকক্ষে শতাধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে হয়, যা কার্যকর শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থী তত্ত্বাবধানকে কঠিন করে তোলে। একজন শিক্ষককে একাধিক কোর্স পরিচালনা, পরীক্ষা মূল্যায়ন, প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং গবেষণাকর্ম একসাথে সামলাতে হয়। এর ফলে গবেষণার সময় কমে যায় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক সহায়তা সীমিত হয়ে পড়ে। বিশেষত গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, থিসিস তত্ত্বাবধান এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মেন্টরিং এই পরিস্থিতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই ধরনের সমস্যা বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার চেষ্টা করলেও অনেক প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে চায়। ফলে সেখানে পূর্ণকালীন শিক্ষকের পরিবর্তে খণ্ডকালীন শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। এতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়। একইসাথে গবেষণা কার্যক্রমও সীমিত থাকে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণা সংস্কৃতির দুর্বলতা, ডক্টরেটধারী শিক্ষকের ¯^ল্পতা, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সুবিধার অভাব এবং বিদেশমুখী মেধাপ্রবাহ এই সংকটকে আরও জটিল করছে। এই বাস্তবতা শুধু শিক্ষার গুণগত মানকেই প্রভাবিত করছে না; বরং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়েও বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলছে। কিউএস র‍্যাংকিংয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কর্মসংস্থান, গবেষণা উৎপাদন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপরও পড়ছে। তাই শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের বর্তমান সংকটকে শুধু প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন ও ^বশ্বিক প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত একটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শিক্ষক সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ পরিকল্পনার অভাব। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নতুন বিভাগ চালুর ক্ষেত্রে অনেক সময় পর্যাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ, গবেষণা সক্ষমতা কিংবা অবকাঠামোগত প্রস্তুতির বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না। ফলস্বরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করলেও সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকে না। অনেক বিভাগে সীমিতসংখ্যক শিক্ষককে অতিরিক্ত কোর্স পরিচালনা করতে হয়, যা শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করে।

গবেষণা পরিবেশের সীমাবদ্ধতাও শিক্ষক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য উন্নত ল্যাবরেটরি, পর্যাপ্ত অনুদান, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবেশাধিকার এবং গবেষণা সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব সুযোগ সীমিত। ফলে অনেক মেধাবী তরুণ গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আবার যাঁরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশে যান, তাঁদের একটি অংশ উন্নত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশে ফিরে আসেন না। এই “ব্রেইন ড্রেইন” বা মেধাপ্রবাহ দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করছে।

একইসাথে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবও সংকটকে গভীর করছে। অনেক সময় মেধা, গবেষণা দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনার পরিবর্তে অন্যান্য বিষয় প্রাধান্য পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এতে প্রকৃত মেধাবীরা নিরুৎসাহিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতামূলক একাডেমিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। শিক্ষকতার পেশাগত মর্যাদা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বেতন কাঠামো, গবেষণা অনুদান এবং পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় সীমিত হওয়ায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা কর্পোরেট খাত বা বিদেশমুখী পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিও শিক্ষক সংকটকে তীব্র করে তুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেকেই অবকাঠামো ও শিক্ষক সক্ষমতা বিবেচনা না করেই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। এর ফলে সীমিতসংখ্যক শিক্ষককে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সামলাতে হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের ওপর পাঠদান, পরীক্ষা মূল্যায়ন, প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং গবেষণার বহুমুখী চাপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক উন্নয়নকে সীমিত করে। সব মিলিয়ে শিক্ষক সংকট

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত সমস্যা, যার সাথে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, গবেষণা সংস্কৃতি, নিয়োগ নীতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সংকট সমাধানে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

অতিরিক্ত শিক্ষার্থীসংখ্যা শিক্ষার মানকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি শ্রেণিকক্ষে যখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হয়, তখন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেন না। ফলে পাঠদান অনেকাংশে একমুখী বক্তৃতাভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, শ্রেণিকক্ষ আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নিজেদের একাডেমিক দুর্বলতা নিয়ে শিক্ষকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করার সুযোগও পায় না।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা গবেষণা কার্যক্রমকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষককে যখন অতিরিক্ত কোর্স পরিচালনা, পরীক্ষা মূল্যায়ন এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, তখন গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকে না। ফলে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রকাশনা কমে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষত কিউএস এর মতো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে গবেষণা এবং একাডেমিক সুনামের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় এই সমস্যা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশ্বিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একইসাথে মূল্যায়ন পদ্ধতির গুণগত মানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর খাতা, অ্যাসাইনমেন্ট এবং গবেষণাপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। এর ফলে মূল্যায়নের নির্ভুলতা ও মান নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা যথাযথ ফিডব্যাক থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাঁদের একাডেমিক উন্নয়নকে সীমিত করে। গবেষণাভিত্তিক থিসিস বা প্রজেক্ট তত্ত্বাবধানও এই পরিস্থিতিতে দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পেশাগত উন্নয়নেও পড়ে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার কারণে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, মেন্টরিং এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক ক্লান্তি ও পেশাগত হতাশা তৈরি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার গুণগত মানকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণ এবং গবেষণা অর্থায়নের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক

প্রভাব ফেলে। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা, গবেষণা সহায়তা এবং কার্যকর মেন্টরিং ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য উন্নয়ন করতে না পারে, তাহলে বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে। তাই এই সমস্যাকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে নয়, বরং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি নির্মাণের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বের উন্নত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাগুলোতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতকে শিক্ষার গুণগত মানের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছোট ব্যাচভিত্তিক ক্লাস, গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, মেন্টরিং ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা কেবল পাঠদানই করেন না; বরং গবেষণা, উদ্ভাবন এবং ব্যক্তিগত একাডেমিক তত্ত্বাবধানেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একইসাথে উন্নত গবেষণাগার, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শিক্ষক-ছাত্র ভারসাম্যকে কার্যকর রাখে। এশিয়ার অনেক দেশে, বিশেষত সিঙ্গাপুর, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া, উচ্চশিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য এসব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং গবেষণা সক্ষমতা, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক বাস্তবতা প্রমাণ করে যে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা গড়ে তুলতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য রক্ষা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উন্নয়নের জন্য সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। প্রথমত, জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ এবং গবেষণা উন্নয়নকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও মেধাভিত্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে গবেষণামুখী ও দক্ষ শিক্ষক তৈরি হয়। একইসাথে পিএইচডি স্কলারশিপ, গবেষণা অনুদান এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষকদের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে। অনলাইন

লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষাসহায়ক প্রযুক্তি শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে শিল্পখাত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে গবেষণা অর্থায়ন এবং বাস্তবমুখী দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি "সংখ্যাভিত্তিক সম্প্রসারণ" থেকে "মানভিত্তিক উন্নয়ন"-এর দিকে অগ্রসর হওয়াই হওয়া উচিত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নীতির প্রধান কৌশল।

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য রক্ষায় এখনও নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অনেক প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে চায়, ফলে পূর্ণকালীন শিক্ষকের ঘাটতি তীব্র হয় এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও গবেষণা সংস্কৃতিকে দুর্বল করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত গবেষণামুখী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা অনুদান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করা। একইসাথে শিক্ষার্থীসংখ্যা নির্ধারণে অবকাঠামো ও শিক্ষক সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা উন্নয়নও জরুরি। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ গবেষণা, শিক্ষক বিনিময় এবং একাডেমিক অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছে, যা ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। তবে সামগ্রিকভাবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একাডেমিক সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার, ডিজিটাল রিসোর্স এবং গবেষণা অনুদানের সীমাবদ্ধতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ, বিভাগভিত্তিক জনবল পরিকল্পনা, প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস এবং গবেষণা সহায়তা বৃদ্ধি জরুরি। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক মানোন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও কম নয়। দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী, উচ্চশিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার

সম্প্রসারণ ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক ভিত্তি তৈরি করছে। যদি শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উন্নয়ন, গবেষণায়

বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, গবেষণা এবং একাডেমিক কার্যক্রমে অগ্রগতি অর্জন করছে, যা আশাব্যঞ্জক। কিউএস-এর মতো আন্তর্জাতিক সূচকে উন্নতি করতে হলে শুধু অবকাঠামো নয়, বরং গবেষণা সংস্কৃতি, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক গবেষণা অংশীদারিত্ব এবং শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। বাংলাদেশ যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে পারে, তাহলে আগামী এক দশকে দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চশিক্ষা মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা সম্ভব হবে।

কিউএস সূচকের আলোকে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কেবল একটি পরিসংখ্যানগত বিষয় নয়; বরং এটি উচ্চশিক্ষার গুণগত মান, গবেষণা সক্ষমতা এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে গত দুই দশকে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলেও সেই তুলনায় শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা অবকাঠামো এবং একাডেমিক মানোন্নয়ন পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীন শিক্ষাদান, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান বাস্তবতায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা। একইসাথে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে দক্ষ শিক্ষক, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং সুষম শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছাড়া বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করতে হলে এখনই পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।